সুধাপারাবার

প্রফুল্ল রায়

SUDHAPARABAR

A Bengali Novel

by

PRAFULLA RAY

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

নবকলেবরে প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা—১৩৭১ সাল

প্রচ্ছদ
ধীরেন শাসমল

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

ধীরেন্দ্র শাসমল

স্নেহাস্পদেষু

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে প্রীতিরা যখন দূরযাত্রী ট্রেনটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন বিকেল। ফাল্গুন অর্থাৎ ষষ্ঠ ঋতুর বাতাসে সেই মুহূর্তে নেশার ঘোর লাগতে শুরু করেছে, রোদে লেগেছে গলানো গিনির রঙ।

এই ট্রেনটা সোজা সুরাট যাবে না। সুরাটের জন্য চারখানা কামরা এতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভুসাওয়ালে সেগুলো কেটে নিয়ে সুরাটগামী অন্য ট্রেনের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হবে।

এই ট্রেনটা না ধরে উপায় ছিল না। কেন না গাড়িটা রাত একটায় ভুসাওয়াল জংশনে পৌঁছুবে, সেখান থেকে অমলের ওঠার কথা। টেলিগ্রাম করে সেই রকম ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছেন মোহিতকাকা। ভুসাওয়াল জংশনে অমল যদি সত্যি সত্যিই আসে (মোহিতকাকা যখন টেলিগ্রাম করেছেন নিশ্চয়ই আসবে) জীবনে এই প্রথম তাকে দেখতে পাবে প্রীতি। সেজন্য হৃৎপিণ্ডে সামান্য দোলাটুকু লাগেনি, রক্তস্রোতে চাঞ্চল্য জাগেনি। প্রীতির প্রাণের ভেতরটা চাক চাক বরফের মতন কঠিন শীতল উদাসীন কিছু দিয়ে ঢাকা। জগতের কোন ব্যাপারেই সেখানে তরঙ্গ ওঠে না। অথচ ললিতাকাকিমা আর মোহিতকাকার কাছে দু বছর ধরে অমলের কত গল্পই না সে শুনেছে। কিন্তু অমলের কথা এখন না, পরে।

ফার্স্ট ক্লাসের সব আসন রিজার্ভড্। অগত্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে এই গাড়িটার দুয়ারে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল প্রীতিদের। প্রীতিরা বলতে মোহিতকাকা, ললিতাকাকিমা, মোহিতকাকার বোন যূথিকা, একটা ছোকরা চাকর আর প্রীতি নিজে। কিন্তু ট্রেনের যাত্রী মাত্রেই মহাভারতের দুর্যোধন। বিনাযুদ্ধে একইঞ্চি জমি ছাড়তেও কেউ রাজি না। কামরায় কামরায় ধাক্কা দিয়ে প্রথমটা প্রীতিদের হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রচুর

বাক্য এবং ততোধিক বাহুবলের বিনিময়ে একটা দরজা কয়েক সেন্টি-মিটার ফাঁক করতে পেরেছিলেন মোহিতকাকা, ঐ ফাঁকটুকু পেয়েই তিনি ম্যাজিক দেখিয়ে দিয়েছেন। আগে নিজে ঢুকেছেন, তারপর একে একে প্রীতিদের তুলেছেন। বাক্স, বাস্কেট, বিছানা, কাঁচের সোরাই, কিছুই ফেলে আসেন নি। উঠেই কিন্তু সন্তুষ্ট থাকেন নি মোহিত-কাকা, বসবারও বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। জানালার ধার ঘেঁষে যূথিকা আর প্রীতিকে বসিয়েছেন, মুখোমুখি একটা বেঞ্চিতে ললিতা-কাকিমা আর নিজে বসেছেন। ছোকরা চাকরটাকে বাঙ্কের মালপত্রের ভেতর গুঁজে দিয়েছেন।

মোহিতকাকার বয়েস পঞ্চাশের সীমান্তে। ছ-ফুট দীর্ঘ মজবুত চেহারা, গায়ের রঙ টকটকে, তীক্ষ্ণ নাকের দু পাশে সজাগ চোখ, লম্বাটে চিবুক। কয়েকটি চুলের রংবদল আর শরীরে বয়েসের কিছু ভার পড়া ছাড়া সময় তাঁর ওপর আর কোন ছায়াই ফেলতে পারেনি। বিস্তৃত কপাল যদি সাফল্যের প্রতীক হয় তা হলে বলতে হবে জীবনে তিনি সফল। সত্যিই সফল—কৃতী ব্যবসাদার মোহিতকাকা; মাসিক আয় হাজার দশেকের মতন।

ললিতাকাকিমা গত শ্রাবণে চুয়াল্লিশের দেউড়িতে পা দিয়েছেন। সেই উপলক্ষে কলকাতায় যোধপুর পার্কের বাড়িতে ঘটা করে জন্মদিনের উৎসব পালন করা হয়েছে। প্রচুর করতালির মধ্যে বার্থ-ডে কেক কেটেছেন ললিতাকাকিমা, ফুঁ দিয়ে দিয়ে চুয়াল্লিশটা মোমবাতি নিভিয়েছেন। প্রচণ্ড হুল্লোড়ের ভেতর শোনা গেছে 'হ্যাপী বার্থ ডে', 'মেনি মেনি হ্যাপী রিটার্নস্।' ললিতাকাকিমার মোটাসোটা থসথসে সুখের শরীর। দিনরাত উল বোনা ছাড়া কাজ নেই। অর্থাৎ বিনা কাজের দিনযাপনের ফল হয়েছে এই; দেহে ইতিমধ্যেই প্রচুর চর্বি জমিয়ে ফেলেছেন। একদা রূপসীই ছিলেন, সৌন্দর্যের রেখাগুলি চর্বির তলায় ঢাকা পড়ে গেছে।

মোহিতকাকা ললিতাকাকিমার ছেলেপুলে নেই। মোহিতকাকার একমাত্র বোন যূথিকা। গায়ের রং পাকা ধানের উপমা। বব্-করা লালচে চুল, নীলাভ চোখ, তীক্ষ্ণ চিবুক, নিটোল রক্তাভ হাত। নখ এবং ঠোঁট রক্তবর্ণে রঞ্জিত, আই-ব্রো পেনসিলে নিখুঁত করে ভুরু আঁকা।

প্রসাধনীর ব্যবহার তার মোটামুটি রুচিশোভন। সব মিলিয়ে তাকে বিদেশিনী মনে হয়। তবে ব্লাউজের মাপ দ্রুত যেভাবে সংক্ষিপ্ত হতে শুরু করেছে, শাড়িটা যেভাবে স্বচ্ছ, তাতে শঙ্কিত হবার কারণ আছে।

মোহিতকাকার বাড়িতে বিদেশী অনেক রকম ম্যাগাজিন আসে, তাতে টপলেস্ বিকিনি ড্রেসের ছবি দেখেছে প্রীতি। ঐ রকম পোশাক কলকাতায় চালু হলে যূথিকাই খুব সম্ভব তা পরে প্রথম রাস্তায় বেরুবে। তার কাজ হল ঘণ্টায় ঘণ্টায় শাড়ি বদলানো আর টু-সীটারের চাকায় ঝড় তুলে কলকাতায় দুরন্ত ঘূর্ণির মতন ছুটে বেড়ানো। টমবয়! সুখী সচ্ছল সংসারের আদুরে মেয়ে। খেয়ালের ঠিকঠিকানা নেই, যখন যা খুশী করছে, যেখানে ইচ্ছে যাচ্ছে। মনটা একমুঠো রঙিন বাষ্পের মতন আকারবিহীন। দু বছর ধরে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে আসছে, পাসটা আর করে ওঠা হচ্ছে না। সেজন্য বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা বা আক্ষেপ আছে, এমন মনে হবার কারণ নেই।

আর প্রীতি নিজে? সে কালো মেয়ে, কাব্য করে বড় জোর শ্যামাঙ্গী বলা যেতে পারে। হাত-পা-নাক-মুখ, কোন কিছুতেই চমৎকারিত্ব নেই। তার যা কিছু মনোহারিত্ব ঘন-পালকে-ঘেরা দুটি বড় বড় চোখেই থাকতে পারত, কিন্তু সে দুটি ছায়াচ্ছন্ন। সর্বক্ষণ গাঢ় গভীর এক বিষাদ প্রীতিকে ঘিরে আছে।

জগতে প্রীতির কেউ নেই, বাপ-মা-ভাই-বোন কেউ না। মোহিতকাকা তার নিজের কাকা নন; গ্রাম সম্পর্কে কাকা। তাঁর সঙ্গে কোনরকম রক্তের-বন্ধন নেই। ওঁদের সংসারে নিতান্তই আশ্রিতা সে। প্রীতির কথা এখন না, পরে বিস্তৃতভাবে তা বলতে হবে।

গাড়িতে উঠেই চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিলেন ললিতাকাকিমা, 'ওরে বাবা রে, এ কোন্ অন্ধকূপে এনে তুললে! দম আটকে আমি মরে যাব।'

যূথিকাও নাকে-কান্না জুড়েছিল, 'গদি নেই, এয়ার কণ্ডিশানিং নেই, অন্ততঃ একটা ফ্যানও যদি থাকত! তার ওপর এত লোক— বিচ্ছিরি, নোংরা—' বলতে বলতে নাক কুঁচকে গিয়েছিল।

মোহিতকাকা বলেছিলেন, 'সেকেণ্ড ক্লাসে গদি-এয়ারকণ্ডিশানিং থাকবে কোত্থেকে ? আর ঐ দেখ্ ফ্যান ছিল, কারা খুলে নিয়ে গেছে। চিরকাল তো হয় ফার্স্ট ক্লাস না হয় এয়ার-কণ্ডিশানড্ কোচে ঘুরেছিস। একবারটা না হয় একটু কষ্ট করলি। আর জানিস তো কষ্ট না করলে কেষ্ট—' বলতে বলতে থমকে গিয়েছিলেন মোহিতকাকা, খুব সম্ভব ছোট বোনের সঙ্গে ফাজলামির সীমারেখাটা হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে থাকবে।

ললিতাকাকিমা বলেছিলেন, 'তোমার বাপু ফাস্ট ক্লাস রিজার্ভ করা উচিত ছিল। এত কষ্ট আর গরমে—'

বাধা দিয়ে মোহিতকাকা বলেছিলেন, 'ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ করতে গেলে বোম্বাইতে আরও দশটা দিন বসে থাকতে হত। এ গাড়ির সব সীট দশদিনের জন্যে বুকড্। ওদিকে হিজ হাইনেস অমলচন্দ্র— মানে তোমার ব্রাদার ছুটি নিয়ে ভুসাওয়ালে প্রহর গুনছে। দশ দিন ছুটি নষ্ট হলে আমাদের সঙ্গে দ্বারকা-টারকায় যেতে পারত সে ?'

ললিতাকাকিমা এবার চুপ করে গেছেন। কিন্তু যূথিকার নাকি-সুরের কান্না সহজে থামতে চায়নি।

বোম্বাই থেকে গাড়িটা ছেড়েছিল সন্ধ্যের খানিক আগে। তারপর একটার পর একটা স্টেশন পেছনে ফেলে পশ্চিম ভারতের কঠিন মাটির ওপর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে লম্বা পায়ে নেমে এসেছে রাত। আকাশে চন্দনের পাটার মতন গোল একটি চাঁদ উঠেছে। রাতটাও এক জায়গায় থমকে থাকে নি, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার বয়েসও ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল।

এখন প্রায় এগারটা বাজে। এরই মধ্যে যাত্রীদের ঢুলুনি শুরু হয়ে গেছে। ললিতাকাকিমা ঘন ঘন হাই তুলছেন। যূথিকার চোখ বুজে আসছে, মোহিতকাকারও ঢুলু ঢুলু ভাব।

ললিতাকাকিমা বললেন, 'আমি বাপু আর চোখ মেলে রাখতে পারছি না—' বলে আর অপেক্ষা করলেন না, সামান্য সংক্ষিপ্ত জায়গাটুকুতে তৎক্ষণাৎ মাথা কাত করলেন।

'আমারও বড্ড ঘুম পাচ্ছে।' যূথিকাও শোবার ব্যবস্থা করে নিল।

'আমিও যে জেগে থাকতে পারছি নারে—'আরক্ত ঘুমজড়িত চোখে কোনরকমে তাকিয়ে মোহিতকাকা বললেন, 'কিন্তু সবাই ঘুমুলে কি করে চলবে? অমল তো কামরায় কামরায় ডাকাডাকি করে বেড়াবে। সাড়া না পেলে ভাববে এ ট্রেনে আমরা আসিনি। একজন কারো জেগে থাকা দরকার। আমি যে জাগব এমন শক্তি নেই, চোখ একেবারে ভেঙে আসছে।'

জড়ানো ডুবন্ত সুরে ললিতাকাকিমা আর যূথিকা বলল, 'আমারও —আমারও—'

মোহিতকাকা বললেন, 'ভারি বিপদে পড়া গেল তো।' বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি এসে পড়ল প্রীতির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাটার সমাধান যেন হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন। বললেন, 'এই মেয়ে, তুই তো খুব রাত জাগতে পারিস। সেবার আমার অসুখের সময় পর পর সাত রাত জেগেছিলি—'

প্রীতি কিছু বলল না, মৃদু হাসল।

মোহিতকাকা আবার বললেন, 'তোকে একটা কাজ করতে হবে। দেখছিস তো আমরা সব কেমন একেকটি ঘুমকাতুরে। তুই মা একটু জেগে থাকবি। ভুসাওয়াল জংশনে ট্রেন থামলে অমল আমাদের ডাকবে। ডাক শুনলেই আমাকে তুলে দিবি। পারবি তো?'

খুব আস্তে প্রীতি বলল, 'পারব।'

'ভুলে যাস না আবার, তাহলে এত দূরে ছুটে আসাই সার হবে।'

'আপনি ভাববেন না।'

'আমি জানি তোর ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।' সস্নেহে প্রীতির মাথায় একটা টোকা দিয়ে চোখ বুজে হোল্ডঅলে মাথা রাখলেন মোহিতকাকা, নিমেষে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও গাঢ় ঘুমে নিমজ্জিত হয়ে গেল তাঁর।

প্রীতি ছাড়া এখন আর এ কামরায় কেউ জেগে নেই। ট্রেনের দোলানিতে তারও চোখ জুড়ে আসতে চাইছিল কিন্তু উপায় নেই। মোহিতকাকা বিরাট দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পালনের জন্য বিনা ঘুমে তাকে নিশিযাপন করতে হবে।

লক্ষ্যহীন অলস চোখে একবার চারদিকে তাকাল প্রীতি!

দ্বিতীয় শ্রেণীর এই কামরাটাকে এখন যুদ্ধশিবির মনে হচ্ছে। বাক্স, বিছানা, ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, ঝুড়ি, হোল্ডঅল—নানা ধরনের লটবহর যত্রতত্র স্তূপীকৃত। এ সবের ফাঁকে মানুষ, সে মানুষও বিচিত্র। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে যতগুলি প্রদেশ আছে তাদের কেউ এ গাড়ির এই কামরাটিতে প্রতিনিধি পাঠাতে ভুল করেনি। তাই দেখা যাচ্ছে বিপুলা সিন্ধি মহিলাটির পিঠে ঠেসান দিয়ে কেরলীয় ভদ্রলোকটি পরিপাটি নিদ্রা দিচ্ছেন। পাঞ্জাব কেশরীর গা ঘেঁষে ক্ষীণ বঙ্গসন্তানটি শোভা পাচ্ছেন। অদ্ভুত সহাবস্থান, সত্যিকার লোকসভা দিল্লীতে না, খুব সম্ভব ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোতে।

এখন সবাই ঘুমুচ্ছে। মিহি-মোটা নানারকমের নাসিকা-বাদনে বিচিত্র কনসার্ট বেজে চলেছে।

কিছুক্ষণ কামরার দৃশ্য আর দু-আড়াইশো নাকের ডাক শুনে কাটিয়ে দিল প্রীতি। আস্তে আস্তে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রেলের একটা টাইম টেবলের ওপর। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বইটা তুলে নিল সে। সময় কাটাবার পক্ষে এটা অব্যর্থ মুষ্টিযোগ। উদাস আঙুলে পাতা ওল্টাতে লাগল প্রীতি; এই ভারতবর্ষে কত স্টেশনই না আছে, আর কি বিচিত্র তাদের সব নাম!

ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় প্রীতির চোখ আটকে গেল। এ গাড়ির গতিবিধির খবর এখানে লেখা আছে।

পরধারে—মাহেজি—শিরসোলি—জলগাঁও—ভাদলি। পর পর স্টেশনগুলোর নাম পড়তে লাগল প্রীতি। হঠাৎ তার মনে পড়ল, খানিক আগে ট্রেনটা জলগাঁওতে থেমেছিল। জলগাঁওর পরই ভাদলি, ভাদলিতে এ গাড়ি ধরবে না। সোজা ভুসাওয়ালে গিয়ে থামবে।

সোয়া একটায় গাড়িটা ভুসাওয়াল পৌছুবে, মাত্র পনের মিনিটের জন্য গতি-ভঙ্গ। তার মধ্যেই চারখানা কামরা কেটে সুরাটের ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হবে এবং তারপরই সেই ট্রেনটা আবার ছুটতে শুরু করবে।

এখন কত রাতে? এদিক সেদিক তাকাতেই প্রীতি দেখতে পেল, যূথিকার ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় একটা বেজেছে।

আর মাত্র মিনিট পনের। ভুসাওয়াল জংশনে অমলের ডাক কানে এলেই মোহিতকাকাকে ডেকে দেবে প্রীতি, তারপর বাকি রাতটুকু সে ঘুমোবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে কৌতুক বোধ করল প্রীতি; গদি-বিহীন শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা-বর্জিত থার্ড ক্লাসের ঠাসাঠাসি ভিড়ে অসহ্য গরমে জনতার সঙ্গে একাকার হয়ে সুখী সচ্ছল পবিতৃপ্ত মোহিতকাকারা কেন এই ট্রেনে পাড়ি জমিয়েছেন সে কথা ভেবে একটু মজা।

অমল হচ্ছে ললিতাকাকিমার ভাই। দু বছর ধরে ললিতা-কাকিমার মুখে প্রীতি শুনে আসছে, এমন ছেলে হয় না। মোহিত-কাকাও উচ্ছ্বাসিত হয়ে তাতে সায় দিয়েছেন। স্কুল কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি—কোন পরীক্ষাতেই নাকি সেকেণ্ড হয় নি অমল। ছাত্র জীবন তার অসাধারণ উজ্জ্বল, দীপ্তিময়। ললিতাকাকিমার কাছে অমলের ফোটো নেই; মুখে মুখে নিজের ভাইয়ের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, যে-কাউকে মুগ্ধ বিস্মিত এবং চমৎকৃত করার পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু মুগ্ধ বা বিস্মিত কিছুই হয়নি প্রীতি। মুগ্ধ হবার মতন মনের গঠনই নয় তার। প্রীতির বুকের ভেতর আবেগের নদীগুলি কবেই শুকিয়ে গেছে। দু বছর ধরে শুনে শুনেও অমল সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করে নি সে অমল কেন, জগতের কোন ব্যাপারেই কৌতূহল বোধ করে না প্রীতি; তাকে ঘিরে মেরু প্রদেশের জমাট কঠিন শীতল উদাসীনতা।

ললিতাকাকিমা বলেছেন, ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবার পরই ব্যাঙ্কে বিরাট চাকরি নিয়ে ভুসাওয়াল এসেছে অমল, সাত বছর ওখানেই আছে। অমলের স্বভাব নাকি অনেকটা উদ্ভিদের মতন। যেখানেই যায় ডালপালা মেলে শিকড় ছড়িয়ে বসে, সহজে নড়তে চায় না। সাত বছরে ছুটিছাটা তো কম পায়নি কিন্তু দুদিনের জন্য যে কলকাতায় ঘুরে আসবে সেটা আর হয়ে ওঠে নি। ললিতা-কাকিমা মোহিতকাকা চিঠি লিখে লিখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আর সাত বছর ধরে প্রতি চিঠির উত্তরে অমল একই কথা লিখেছে, এবার যাব—এবার যাব।

ললিতাকাকিমা মোহিতকাকার এত ঘন ঘন চিঠি লেখার পেছনে স্বার্থের একটু ছোঁয়া আছে। তাঁদের ইচ্ছে, অমলের সঙ্গে যূথিকার বিয়ে দেবেন। তাগিদ দিয়ে দিয়েও যখন অমলকে কলকাতায় আনতে পারলেন না তখন সিদ্ধান্ত করলেন নিজেরাই অমলের কাছে যাবেন। আসি আসি করেও মোহিতকাকার সব ঝামেলায় ক'মাস কেটে গেছে। তারপর দিন দশেক আগে ব্যবসার দুর্ভাবনা একপাশে ফেলে রেখে সবাইকে নিয়ে বোম্বাই মেলে উঠেছিলেন। রথ দেখা কলা বেচার মতন অমলের কাছে যাওয়াটা তো আছেই, ফাউ হিসেবে বোম্বাই শহরটাও দেখে নিয়েছেন।

কলকাতা থেকে অমলকে টেলিগ্রাম করে দিন পনেরর ছুটি নিতে লিখেছিলেন মোহিতকাকা। বোম্বাই এসে আরেকটা টেলিগ্রাম করেছিলেন, অমল যেন আজকের এই গাড়িটা ধরবার জন্য স্টেশনে আসে, একটু খোঁজ করে তাঁদের বার করে নেয়।

ভুসাওয়াল থেকে অমলকে তুলে নিয়ে মোহিতকাকারা সুরাট, দ্বারকা, ভেরাবল, প্রভাস ইত্যাদি জায়গায় যাবেন। উদ্দেশ্য এই ঘোরাঘুরির ফাঁকে যূথিকা আর অমলকে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দেওয়া। সাত বছর আগে অবশ্য যূথিকাকে দেখেছে অমল, যূথিকা তখন কিশোরী। তাই বিয়ের প্রশ্ন ছিল না।

কতক্ষণ নিজের ভাবনার ভেতর ডুবে ছিল মনে নেই। খেয়াল হতেই প্রীতি টের পেল, গাড়ির গতি স্তিমিত হয়ে আসছে। চমকে ঘড়ির দিকে তাকাল সে, একটা বারো। আর তিন মিনিট পরেই ভুসাওয়াল জংশন।

অতর্কিতে আরেকটা ব্যাপার মনে হতে সামান্য চমক লাগল প্রীতির। যার জন্য এত আয়োজন, বাংলাদেশ থেকে কয়েক শো মাইল পাড়ি দিয়ে এত দূরে ছুটে আসা, যূথিকার কিন্তু সে ব্যাপারে দুশ্চিন্তা বা ব্যগ্রতা নেই। পরম নিশ্চিন্তে পরিতৃপ্ত নিটোল ঘুমের ভেতর সে ডুবে আছে আর প্রীতি কিনা সমস্ত অস্তিত্ব তীক্ষ্ণ উন্মুখ করে অমলের জন্য জেগে বসে রয়েছে! কৃতজ্ঞতা, নিছক কৃতজ্ঞতা। মোহিতকাকারা আশ্রয় দিয়েছেন, তার বদলে রাতজাগা তো সামান্য ব্যাপার, ওঁরা বললে আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারে প্রীতি।

দেখতে দেখতে ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামল। যাত্রীদের চেঁচা-মেচি, ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। স্টেশনটা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, অতর্কিত প্রবল ঝাঁকুনিতে মুহূর্তে সেটা যেন সজাগ হয়ে উঠেছে। বাইরে কুলিদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, 'ভুসাওয়াল—ভুসাওয়াল—ভুসাওয়াল—'

সমস্ত ইন্দ্রিয় কানের ভেতর এনে জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিল প্রীতি। প্লাটফর্মে ফ্লুরোসেন্ট আলোর ঢল নেমেছে। তার তলায় যাত্রীরা, ভেণ্ডাররা কুলিরা ছোটাছুটি করছে। তাদের কামরা থেকেও কেউ কেউ নামল, কেউ কেউ উঠল।

কোনদিকে লক্ষ্য নেই প্রীতির। দূরবিস্তৃত প্লাটফর্মের দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে সে। অসংখ্য যাত্রীর ভেতর কে অমল, কে তাকে বলে দেবে।

মুহূর্তগুলো ঘোড়ার পিঠে উঠে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কই, কেউ তো এ কামরার জানালায় মুখ বাড়িয়ে মোহিতকাকা যূথিকা অথবা ললিতাকাকিমাকে ডাকছে না। তবে কি—তবে কি অমল আসেনি?

এর ভেতর চারখানা কামরা কেটে নিয়ে সুরাটগামী ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সুরাটের ট্রেন ছাড়ার জন্য দু বার ঘন্টি পড়ে গেছে। তৃতীয় ঘন্টির সঙ্গে সঙ্গে গার্ডের হুইসিল শোনা যাবে, ট্রেনও নতুন উদ্যমে ছুটতে শুরু করবে।

তৃতীয় ঘন্টিটা পড়তে যাবে, সেই সময় দেখা গেল একটি সুপুরুষ তরুণ উৎকণ্ঠিতের মতন কামরায় কামরায় উঁকি দিচ্ছে আর ডাকছে, 'মোহিতদা—মোহিতদা—'

নিশ্চয়ই অমল। মোহিতকাকা চোখ বোজার আগে বলেছিলেন অমলের ডাক শোনামাত্র যেন তাকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রীতি আস্তে করে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল, 'কাকু-কাকু', কিন্তু ঘুম ভাঙার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বরং নাসিকাবাদন আরো প্রবল হয়ে উঠল।

এদিকে তরুণটি এসে এ কামরায় ডাকাডাকি শুরু করেছে। মোহিতকাকাকে জাগাতে গেলে যে সময়টুকু নষ্ট হবে ততক্ষণ তরুণটি অপেক্ষা করবে না, জানালার ফ্রেম থেকে তার মুখ সরে পাশের কামরায় চলে যাবে।

একটু ইতস্ততঃ করল প্রীতি। তারপর সব দ্বিধা দু হাতে সরিয়ে যুবকটির দিকে তাকাল। ঈষৎ কাঁপা গলায় বলল, 'আপনি অমলবাবু?'

যুবকটি অবাক। বাংলাদেশ থেকে এতদূরে সুরাটগামী ট্রেনের কামরায় অচেনা এক তরুণীর মুখে নিজের নাম শুনে সে বিমূঢ় হয়ে গেছে। ব্যাপারটা অভাবিত, অকল্পনীয়ও। সেই যে কারা যেন খড়ি পেতে ভূ-ভারতের সব খবর বলে দিতে পারত, মেয়েটি কি তেমন কোন যাদুবিদ্যা জানে?

খানিক অধৈর্যের সুরে প্রীতি এবার বলল, 'আপনি অমলবাবু তো?'

আস্তে মাথা নাড়ল অমল, বিস্ময় তার প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে।

এই সময় তৃতীয় ঘণ্টি শোনা গেল, সেই সঙ্গে গার্ডের বাঁশি। পরমুহূর্তেই ইঞ্জিনের হুইসিল বেজে উঠল—ট্রেনের দীর্ঘ শরীর একটা বিশাল সরীসৃপের মতন আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল।

প্রীতি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'উঠে পড়ুন—শিগগির উঠে পড়ুন—'

বিভ্রান্তের মতন অমল বলল, 'কিন্তু—'

অমলের মনোভাব বুঝতে পারল প্রীতি। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'মোহিতবাবুকে চান তো? তিনি এ কামরাতেই আছেন, ঘুমুচ্ছেন। আর দেরি করবেন না, গাড়ির স্পীড বেড়ে যাচ্ছে, এর পর উঠতে পারবেন না।'

ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল অমল। আর কিছু বলল না সে, প্রায় সম্মোহের ঘোরে হ্যাণ্ডেল ধরে ওপরে উঠে এল। প্রীতির বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল, সহজভাবে এবার শ্বাস নিতে পারল সে।

কামরার ভেতর আসতেই মোহিতবাবুদের দেখতে পেল অমল। আশ্বস্ত হয়ে সে প্রীতিকে বলল, 'মোহিতবাবু আমার জামাইবাবু হন। এই ট্রেনে—'

মৃদু গলায় প্রীতি বলল, 'আমি আপনার পরিচয় জানি।'

'কিন্তু আপনার পরিচয় আমার জানা নেই।'

অস্ফুট উদাসীন সুরে প্রীতি বলল, 'দেবার মতন পরিচয় আমার নেই।'

মেয়েটি কে, মোহিতবাবুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, পরিচয়ই বা দিতে চাইছে না কেন—কে বলবে। বিমূঢ়ের মতন একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল অমল। তারপর ঘুমন্ত মোহিতবাবুর ওপব বর্গীর মতন হানা দিল, ধাক্কা দিতে দিতে জোবে জোরে ডাকতে লাগল, 'জামাইবাবু—জামাইবাবু—'

প্রীতি লক্ষ্য করল, মোহিতকাকা ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ঘুম ভেঙেই অমলকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশিতে তাঁর মুখচোখ আলো হয়ে উঠল। ব্যস্তভাবে বললেন, 'যাক, এসেছ তাহলে—'

'না আসার জন্যে টেলিগ্রাম করেছিলেন নাকি?' ঝুঁকে মোহিতকাকার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল অমল।

এদিকে চেঁচামেচি করে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে যূথিকা আর ললিতাকাকিমার ঘুম ভাঙিয়ে ফেললেন মোহিতকাকা, 'দেখ দেখ কে এসেছে!'

অমল এবার ললিতাকাকিমাকে প্রণাম করল। তার চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে চুমু খেলেন ললিতাকাকিমা। সস্নেহে বললেন, 'কতদিন পর তোকে দেখলাম ছোটন, কি রোগা হয়ে গেছিস!'

দূরে বসে প্রীতি জানতে পারল অমলের আদরের নাম ছোটন।

অমল বলল, 'আমি রোগা হচ্ছি আর তুই কিন্তু হাতি হয়ে উঠেছিস সেজদি।'

ললিতাকাকিমা হেসে ফেললেন, 'যা বলেছিস ভাই, দিন দিন ফুলছি।'

মোহিতকাকা চুপ করে বসে ছিলেন না। সুটকেসের ওপর হোল্ডঅল চাপিয়ে অমলের বসবাব ব্যবস্থা করতে করতে মন্তব্য করলেন, 'তবেই বুঝে দেখ ব্রাদার, তোমার বোনটিকে কেমন সুখে রেখেছি।'

স্বামীর উদ্দেশে ভ্রূভঙ্গ করলেন ললিতাকাকিমা, 'সুখে একেবারে মরে যাই।' ললিতাকাকিমার কটাক্ষ এবং কথাগুলো যে সুখেরই অন্য নাম, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

বসবার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ। মোহিতকাকা ডাকলেন, 'বস হে অমলচন্দর, তোমার জন্যে কেমন চমৎকার সিংহাসন তৈরি করে দিয়েছি, দেখ।'

অমল বসল। কিন্তু ললিতাকাকিমার হাত থেকে মুক্তি পেল না। এতকাল পর ভাইকে পেয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। কলকাতায় যায় না কেন, এখানে কিভাবে থাকে, অন্য বাঙালি-টাঙালি ভুসাওয়ালে আছে কিনা, খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম করে কিনা—ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন করতে লাগলেন। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, একটার জবাব দিতে না দিতে ঝড়ের মতন নতুন প্রশ্ন এসে যাচ্ছে।

মাঝখান থেকে মোহিতকাকা বলে উঠলেন, 'তোমরা দু ভাই বোনই শুধু বকবক করবে নাকি? আর আমরা বোবা হয়ে থাকব? আমাদের দিকে একটু-আধটু কৃপাবর্ষণ কর।'

অমল হেসে তাকাল।

মোহিতকাকা বললেন, 'তারপর অমল, ট্রেনে আমাদেব খুঁজে বার করতে তোমার অসুবিধে হয়েছিল?'

'তা একটু হয়েছিল বৈকি। আমি তো প্রথমে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টগুলোতে খোঁজ করেছি, সেখানে আপনাদের পাত্তা নেই। ভেবেছিলাম, হয়ত এ ট্রেনে আসেন নি। ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এই সেকেণ্ড ক্লাসে আপনাদের আবিষ্কার করলাম।'

ফার্স্ট ক্লাসে কেন আসতে পারেন নি, সংক্ষেপে তার কারণ জানিয়ে দিলেন মোহিতকাকা।

অমল বলল, 'আপনাদের খোঁজার সময় একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে জামাইবাবু—' বলে হাসতে লাগল সে।

'কি?'

'কামরায় কামরায় মুখ বাড়িয়ে 'জামাইবাবু' 'জামাইবাবু' বলে ডাকছিলাম। এদিকে প্রত্যেক কামরায় দু চারজন করে বঙ্গসন্তান ছিল, তারা সাড়া দিতে লাগল। ভাবলাম এতগুলো ভদ্রমহোদয়ের হাতে তো আমার বোনটাকে তুলে দিইনি।'

'আরে সর্বনাশ, এ কি শোনালে শ্যালকচন্দর!' যেন মাথায়

বাজ ভেঙে পড়েছে এমন স্বরে মোহিতকাকা বললেন, 'দশটা না বিশটা না, শিবরাত্রির সলতে ঐ তো একটা মোটে আমার বউ। এই বুড়ো বয়েসে তার এতগুলো ভাগিদার জুটিয়ে ফেললে ব্রাদার!'

কপট রাগে মুখ বাঁকালেন ললিতাকাকিমা, 'যত বয়েস হচ্ছে ইয়ার্কি তত বাড়ছে, মুখে কিচ্ছু আটকায় না।'

সবাই হেসে উঠল, এমন কি যে প্রীতি সব সময় বিষাদময়ী ছায়াচ্ছন্ন শীতল নিরুত্তাপ সেও সামান্য একটু না হেসে পারল না।

হাসির উচ্ছ্বাস কিছু স্তিমিত হলে অমল বলল, 'তারপর ব্যাপারটা কি বলুন তো জামাইবাবু; ব্যবসাপত্তর সব গুটিয়ে ফেলেছেন নাকি?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'কস্মিনকালেও তো কলকাতার ফরটি স্কোয়ার মাইলের বাইরে পা বাড়ান নি, ব্যবসা ছাড়া আর কিছু জানতেন না। এবার কি এমন অঘটন ঘটল যাতে লম্বা পাড়ি জমিয়ে বসেছেন? তাও দু দশ ঘণ্টার জন্যে নয়, বেশ কিছুদিনের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে।'

প্রশ্নটা আপাততঃ এড়িয়ে গিয়ে মোহিতকাকা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ঐ দেখ আমিই শুধু কথা বলছি. যূথির সঙ্গে এখন পর্যন্ত তোমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি।'

অমল ঈষৎ চকিত হল, 'যূথি মানে যূথিকা? কোথায়?'

মোহিতকাকা কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগে যূথিকাই বলে উঠল, 'আপনি তো কাছের জিনিস দেখতে পান না। ষাট কিলোগ্রাম ওয়েট পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হাইটের জলজ্যান্ত মানুষটা সামনে বসে আছি আর আপনি বলছেন কোথায়!'

দু চোখে অসীম বিস্ময় নিয়ে অমল বলল, 'কি আশ্চর্য। তোমাকে তো চিনতেই পারিনি, ভেবেছিলাম কে না কে। সাতবছর আগে দেখেছিলাম, তখন কত ছোট তুমি। এখন একেবারে লেডি হয়ে উঠেছ। চিনতে পারা সহজ নাকি!'

'আপনাকে কিন্তু দেখেই চিনতে পেরেছি; সাতবছর আগের মতনই আছেন। একটুও বদলান নি।'

'হ্যাঁ।' হাসতে হাসতে অমল বলল, 'আমি চিরকাল গ্রামারের সেই অব্যয় পদটি হয়েই আছি। যোগ বিয়োগ কিচ্ছু নেই।'

যূথিকা হাসল। ললিতাকাকিমা মোহিতকাকাও হাসলেন।

অমল আবার বলল, 'পড়াশোনা নিশ্চয়ই করছ?'

নখ খুঁটতে খুঁটতে ঠোঁট ছুঁচলো করে ঘাড় কাত করল যূথিকা।

মোহিতকাকা ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন, 'পড়াশোনা আর কি, কলেজের বুড়িটা ছুঁয়ে আছে, এই পর্যন্ত। দু বছর ধরে বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছে, পাস টাস করার বোধহয় ইচ্ছে নেই।'

ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের একটি ভঙ্গি করল যূথিকা। তারপর নাকি সুরে কাঁপন দিয়ে বলল, 'দাদা!' অর্থাৎ লেখাপড়ার কথা আপাততঃ মুলতুবী থাক।

মোহিতকাকা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, অতর্কিতে কি যেন মনে পড়ে গেল অমলের। ব্যস্তভাবে বলল, 'সবার সঙ্গে গল্প-টল্প করছি কিন্তু উনি চুপ কেন? ওঁর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দিলেন না জামাইবাবু—' প্রীতিকে দেখিয়ে দিল সে।

এতক্ষণ নিজের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত করে বসেছিল প্রীতি। সকলের সামনে থাকলেও তার ভূমিকা নেপথ্যচারিণীর, এই তার স্বভাব। এমনভাবে শামুকের মতন নিজেকে গুটিয়ে সে আত্মগোপন করে থাকে যে তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। নিজেকে মুছে দেবার ভেতরেই বুঝিবা তার যত আনন্দ। তার সামনে যত কথাই হোক—যত উত্তেজনা, যত পরিহাস, যত কৌতুকের খেলা—কিছুই প্রীতির ওপর ছায়া ফেলে না, দাগ কাটে না। এতটুকু প্রতিক্রিয়া অনুভব করে না সে।

আজ অবশ্য স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করেছে প্রীতি, মোহিতকাকা আর অমলের চড়া-তারে বাঁধা রসিকতা শুনে একটু আগে হয়ত অজান্তে অর্ধমনস্কতার মধ্যে নিঃশব্দে হেসেছে।

যাই হোক, অমলের শেষ কথাগুলোতে চমক লাগল কি? চাক চাক বরফের মতন ভারী নিশ্চল বিষাদে প্রীতির মনের ওপর দিকটা সর্বক্ষণ ঢাকা, তার তলায় কোথাও সামান্য ঢেউ উঠল কিনা প্রীতি বুঝতে পারল না।

এক সময় মোহিতকাকার গলা ভেসে এল, 'ওর নাম প্রীতি।' অমল সম্বন্ধে প্রীতিকে বললেন, 'আর এ কে তা তো জানিসই।'

আস্তে মাথা নাড়ল প্রীতি, অর্থাৎ জানে বৈকি।

অমল বলল, 'নামটা জানা গেল কিন্তু ওটা তো গোটা পরিচয় না।'

খানিক ইতস্ততঃ করে মোহিতকাকা বললেন, 'সম্পর্কে ও আমার ভাইঝি—'

মোহিতকাকার মহত্ত্বের তুলনা নেই। সবাই যখন বিমুখ, সব দুয়ার যখন বন্ধ—সেই সময় একমাত্র তিনিই হাত বাড়িয়ে কাছে টেনেছেন। অমলের কাছে প্রীতি যাতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে, কুণ্ঠিত হয়ে না পড়ে সে জন্য এইমাত্র মিথ্যে বললেন। আসলে তাঁর সঙ্গে প্রীতির কোন সম্পর্কই নেই। এক গ্রামে বাড়ি, এই পর্যন্ত।

অমলের কৌতূহল সীমাহীন। সে বলল, 'সাতবছর আগে যখন কলকাতায় ছিলাম আপনাদের বাড়ি কতবার গেছি কিন্তু এঁকে তো কোনদিন দেখি নি।'

'ও তখন আমার কাছে থাকত না।'

'কোথায় থাকতেন?'

'দেশে—মানে ইস্টবেঙ্গলে।'

'পাকিস্তানে?'

'হ্যাঁ—' আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ঈষৎ ব্যথিত সুরে মোহিতকাকা বললেন, 'মেয়েটা ভারি দুঃখী।'

অমলের গলায় প্রতিধ্বনি শোনা গেল, 'দুঃখী!'

'হ্যাঁ।'

'কিরকম?'

ঝোঁকের বশে বলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেলেন মোহিতকাকা, 'ওসব কথা এখন থাক,।'

এদিকে শ্বাস প্রায় আটকে আসছিল প্রীতির, বুকের ভেতর মেঘাচ্ছন্ন দিনের মতন অত্যন্ত ভারি কষ্টকর কিছু একটা অনুভব করছিল সে।

আর কোন প্রশ্ন না করে অমল প্রীতির দিকে তাকাল। তার চোখদুটি কোমল, ঘনীভূত শিশিরের মতন সহানুভূতিতে সিক্ত। মোহিতকাকার মুখে দুঃখী শব্দটা শুনেই খুব সম্ভব তার মন সমবেদনায় ভরে গেছে। অমল হয়ত সেই জাতের মানুষ, আবেগের স্রোতে

ভেসে যেতে সর্বক্ষণ যে উন্মুখ। আনন্দ-বিষাদ-উচ্ছ্বাস—যে কোন একটা ঢেউ হাতের কাছে পেলেই হল, চোখ কান বুজে বোধহয় তখনিই তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

কিন্তু দুঃখী শব্দটার শক্তি কতটুকু? প্রীতির যা দুঃখ, তাকে ঘিরে যে অসীম অব্যক্ত যন্ত্রণা—ঐ দুর্বল ঝঙ্কারহীন সাদামাঠা শব্দটা দিয়ে তার কতটুকু বোঝানো যায়? প্রীতির অন্তহীন দুঃখের কতটুকু অংশ মাপা যায় ওটা দিয়ে? মোহিতকাকা যদি সব কথা খুলে বলতেন—

প্রীতির ভাবনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অমলের গলা শোনা গেল, 'প্রীতি দেবীর জন্যে এই কম্পার্টমেন্টটা খুঁজে বার করতে পেরেছি। আমি তো হন্যে হয়ে এ কামরায় সে কামরায় আপনাদের ডাকাডাকি করে বেড়াচ্ছিলাম, উনিই আমাকে ডেকে তুলেছেন।'

মোহিতকাকা বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে তোমার জন্যে জেগে থাকতে বলেছিলাম।'

'ওঁকে জেগে থাকতে বলে নিজেরা আরামসে ঘুম লাগাচ্ছিলেন। বাঃ, বেশ তো!'

অমলের গলায় হাল্কা সুরই বাজছে তবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল প্রীতি। মোহিতকাকারা আশ্রয়দাতা, তার প্রতি ওঁদের করুণার তুলনা নেই। সে ঋণ সামান্য রাত জাগায় শোধ হয় না।

ওদিকে মোহিতকাকা অপ্রস্তুত। অপ্রতিভ সুরে বললেন, 'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছিল। তাই—'

অমল বলল, 'আপনার না হয় ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু সেজদি? যূথি?'

আক্রমণটা একেবারে সরাসরি। অতএব আত্মরক্ষা করা দরকার। বিব্রতমুখে তাড়াতাড়ি ললিতাকাকিমা বললেন, 'তুই তো জানিস ভাই, ছেলেবেলা থেকে আমি কেমন ঘুমকাতুরে। ট্রেনে উঠলে তো কথাই নেই, দুলুনি লাগল তো আমারও ঢুলুনি শুরু হল।'

যূথিকার মুখচোখের চেহারা দেখে করুণাই হয়। যে মেয়ে কয়েক শো মাইল পাড়ি দিয়ে এত দূরে স্বয়ম্বরা হতে এসেছে সে কিনা ভাবী বরের জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় জেগে থাকতে পারল না। আদুরে

জেদী উদ্দাম বেপরোয়া যূথিকা কোনরকমে বলতে পারল, 'প্রীতিই তো বললে জেগে থাকবে। ও খুব রাত জাগতে পারে।'

'আর তুমি খুব ঘুমোতে, না?'

সবাই হেসে উঠল।

হাসাহাসির ভেতরেও প্রীতি লক্ষ্য করল, মোহিতকাকা ললিতা-কাকিমার মুখে চকিতের জন্য ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। আর চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল যূথিকা।

অমল আবার বলল, 'এরকম রিস্ক নেওয়া মোটেও উচিত হয়নি। প্রীতিদেবী আমাকে চেনেন না, আগে কোনদিন ছ্যাখেনও নি। আমি যদি না ডেকে কামরায় কামরায় উঁকি দিয়ে চলে যেতাম কেমন হত বলুন তো?'

কেউ উত্তর দিল না।

খানিক চুপচাপ। তারপর অমলই নীরবতা ভেঙে একসময় ডেকে উঠল, 'জামাইবাবু—'

আবহাওয়াটা লঘু করার জন্য হাল্কা গলায় মোহিতকাকা সাড়া দিলেন, 'বলে ফেল হে শালাবাবু—'

'তখন তো সে কথাটার জবাব দিলেন না—'

'কোনটার?'

'হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেলেন কেন?'

'ক্ষেপে গেলাম!'

'নয়তো কী? ব্যবসাপত্তর ছেড়ে কলকাতা ছেড়ে পাক্কা আরব বেদুইন বনে বেরিয়ে পড়েছেন। ফার্স্ট ক্লাস কি এয়ারকণ্ডিশান্‌ড্‌ কোচের পরোয়া করেন নি, থার্ড ক্লাস থার্ড ক্লাসই সই। তার ওপর আমাকে জোর এত্তেলা পাঠিয়েছেন স্টেশনে হাজিরা দিতে। আমার জন্যে রাত জেগে যিনি বসে ছিলেন, ডাকামাত্রই তিনি গাড়িতে তুলে ফেলেছেন, কোন কথা বলার সুযোগ ছ্যান নি। এদিকে—'

'কী?'

'টিকিট কাটি নি, বিনা টিকিটে—'

বাধা দিয়ে মোহিতকাকা বললেন, 'বিনা টিকিটে হবে কেন, দস্তুরমতন তোমার টিকিট কাটা হয়ে গেছে।' পকেট থেকে টিকিট

বার করে দেখালেন মোহিতকাকা, 'ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজকে ফাঁকি দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সবিস্ময়ে অমল বলল, 'বম্বে থেকে কেটেছেন নাকি ?'

'ইয়েস—' মোহিতকাকা ঘাড় কাত করলেন।

'বম্বে থেকে কেটেছেন, উঠেছি ভুসাওয়ালে। তা হলে রেলওয়ের লাভই করিয়ে দিয়েছেন দেখছি।'

'সিওর।'

'কিন্তু আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায় ?'

'আপাতত সুরাট। সেখান থেকে ভেরাবল, দ্বারকা, গির ফরেস্ট—'

'আরে বাবা, এ যে লম্বা পাড়ি।'

মোহিতকাকা কিছু না বলে হাসতে লাগলেন।

অমল বলল, 'আমাকে তো শুধু স্টেশনে আসতে লিখেছিলেন। এমন চরকি কলে ফেলবার ইচ্ছে ছিল তা তো লেখেন নি।'

'সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম। অত কথা খুলে লিখলে স্টেশন পর্যন্ত কি তুমি আসতে ? তোমার নেচার তো জানি ব্রাদার।'

অমল খুঁত খুঁত করতে লাগল, 'জামা-কাপড় কিচ্ছু আনি নি ; ক'টা দিন কিভাবে যে কাটবে।'

'ভাবনার কিচ্ছু নেই ভায়া। বিপদের সময় উপকারেই যদি না লাগলাম বোন বিয়ে দিয়েছিলে কেন ? আমার সুটকেসে যথেষ্ট ধুতি-পাঞ্জাবি আছে ; তাই দিয়ে কাজ চালিয়ে নিও।'

'ধুতি না হয় হল কিন্তু আপনার পাঞ্জাবি কি আমার হবে ?'

'আরে বাপু, যেখানে যাচ্ছি সেখানে কেউ আর তোমার জামার হাতা-ঝুল-পুট ফুট-ইঞ্চি মিলিয়ে মেপে দেখবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

একটু চুপ করে থেকে অমল বলল, 'কিন্তু ব্যাপারখানা কী ?'

'কিসের ?'

'এমন করে বেরিয়ে পড়ার ?'

দূরে বসে প্রীতি বুঝল,, ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা কিছুই জানে না অমল। চিঠিতে এ ব্যাপারে হয়ত স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত দ্যান নি মোহিতকাকা। যূথিকার সঙ্গে মেলামেশার ফলাফল কী দাঁড়ায়, বাতাসে অনুকূল টান লাগে কিনা—সব দেখে বিশ্লেষণ করে মনের ইচ্ছাটা তিনি মেলে ধরবেন। ব্যবসাদার মানুষ, সামনের দিকে এক পা ফেলতে তিনবার ভাবেন। প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর মাপ-জোখ করা, হিসেবী, তীক্ষ্ণ সতর্কতা দিয়ে ঘেরা।

মোহিতকাকা বললেন, 'কলকাতা আর ভাল লাগছিল না, তাই বেরিয়ে পড়লাম। তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে দেখাও হচ্ছিল না অনেকদিন। চিঠি লিখে তো হয়রান হয়ে গেছি।'

তাঁর চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে অমল বলল. 'বিশ্বাস হয় না।'

'কী ?'

'হুট করে এমনি বেরিয়ে পড়ার পাত্র আর যে-ই হোক আপনি নন ; নিশ্চয়ই অন্য কোন মতলব আছে।'

চোখমুখ দেখে বোঝা গেল, মোহিতকাকা অস্বস্তি বোধ করছেন। বললেন, 'আমার সব কিছুর ভেতর তোমরা মতলব দেখ। বলছি, এমনি এসেছি—'

এবার অমল ললিতাকাকিমার দিকে তাকাল, 'কী ব্যাপার রে সেজদি ?'

দু হাত নেড়ে ললিতাকাকিমা বললেন, 'আমি কিছু জানি না বাপু। ক'দিন আগে দুপুরবেলা এসে বললে টিকিট কেটে এনেছি ; রেডি হয়ে নাও। সন্ধ্যেবেলা বম্বে মেল ধরব। হাজার হোক পতিদেবতা, বিনা বাক্যব্যয়ে ছুঁচের পেছনে সুতোর মতন ওর পিছু পিছু বম্বে মেলে এসে উঠেছি।'

চোখ বড় বড় করে অমল বলল, 'ধন্য সেজদি, একালে তোর মতন পতিব্রতা আর বোধহয় একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না! সনাতন ভারতীয় নারীত্বের ঝাণ্ডা একমাত্র তুই-ই বুঝি কাঁধে ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। কিন্তু সিস্টার—'

'কী ?'

'তোমার মুখচোখ দেখে আমার কেমন কেমন লাগছে যেন!'

'কেমন ?' ললিতাকাকিমাকে ঈষৎ শঙ্কিত দেখাল।

'তোমরা কিছু লুকোচ্ছ।'

ললিতাকাকিমা হাতের কাছে কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে মোহিতকাকার দিকে তাকালেন। আর অমল যুথিকাকে নিয়ে পড়ল, 'তুমি কিছু জানো যুথি ?'

যুথিকার কথা না বলাই ভাল। মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যেতে লাগল তার। অমল না জানুক, সে তো জানে কলকাতা থেকে সুরাট পর্যন্ত ছুটে আসার নেপথ্যে মোহিতকাকা, ললিতাকাকিমা এবং হয়ত তার নিজেরও কোন্ গভীর গহন উদ্দেশ্যটা রয়েছে। চোখ নামিয়ে কাঁপা গলায় যুথিকা ফিসফিস করল, 'আমি জানি না।'

এবার অমলের দৃষ্টি এসে পড়ল প্রীতির মুখে, 'আপনি, কিছু জানেন ?'

মোহিতকাকা আর ললিতাকাকিমাকে একবার দ্রুত দেখে নিল প্রীতি; চোখের কোণ দিয়ে তাঁরা ইশারা করলেন। ইঙ্গিতটা বুঝল প্রীতি। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানাল, সে-ও এ ব্যাপারে কিছু জানে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অমল মোহিতকাকাকে বলল, 'সুপার্ব জামাইবাবু—সুপার্ব পারফর্মেন্স—'

মোহিতকাকা চকিত হলেন, 'মানে ?'

'পুতুলনাচের ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতন সুতো টানছেন আর সেজদি, যুথি, প্রীতিদেবী—সবাই মাথা নেড়ে না-না করছে। কিছুই তারা জানে না যেন। অলরাইট, দু-একদিনের ভেতরেই মতলবটা আমি বার করে ফেলব। এখন বলুন—'

'কী বলব ?'

'আপনাদের প্রোগ্রাম কী ?'

বুঝতে না পেরে মোহিতকাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের ?'

হাত উল্টে ঘড়ি দেখে অমল বলল, 'প্রায় দুটো বাজতে চলেছে। ট্রেন তো কাল সকালে সুরাট পৌঁছুবে। বাকি রাতটুকু কী করতে চান ? গল্প করে কাটাবেন, না ঘুমোবেন ?'

ললিতাকাকিমা সুযোগটুকুর অপেক্ষায় ছিলেন বোধহয়

উৎসাহের সুরে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আজ সবাই ঘুমিয়ে পড়। রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে। কাল থেকে আবার ঘোরাঘুরি আছে। ঘুম দিয়ে শরীর ঝরঝরে করে নাও, কাল যত পার গল্প কোরো, গুজব কোরো। যা প্রাণ চায় করে যেও। শরীর খারাপ থাকলে কিন্তু কিচ্ছু ভাল লাগবে না।' বলতে বলতে ঘাড় কাত করে শোবার উদ্যোগ করলেন।

ললিতাকাকিমার প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করলেন মোহিতকাকা, 'সেই ভাল, সেই ভাল। সবাই ঘুমিয়ে পড হে।' বলে নিজে প্রথমে চোখ বুজলেন। ললিতাকাকিমা স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে তাঁর দ্বিমত নেই।

এদিকে অমলের দিকে আড়ে আড়ে তাকিয়ে চোখের পাতায় নাচন দিয়ে ঠোঁট টিপে শব্দহীন হেসে মাথা হেলিয়ে দিল যূথিকা। অমলও কামরার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে চোখ বুজল।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইল প্রীতি। স্টেশনে স্টেশনে যাত্রী নেমে যাওয়াতে পা ছড়িয়ে কাত হবার মতন জায়গা হয়েছে, তার ওপর ট্রেনের দোলানি আছে; বাইরে আরব সাগরের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যে বাতাস উঠে আসছে তাতে শিরশিরে শীতের আমেজ মাখা। একটি পরিপাটি নিটোল ঘুমের পক্ষে আয়োজনটা মোটামুটি ভালই। কিন্তু ঘুমোতে পারল না প্রীতি। ঘুম যখন আসছে না তখন কতক্ষণ আর চোখ বুজে থাকা যায়। একবার চোখ মেলে তাকাল সে।

কেউ জেগে নেই। যাদুঘরে প্রাণীদেহ যেমন রাখা হয় তেমনি ঘুমের আরকে কামরা-ভর্তি মানুষগুলোকে কেউ বুঝি সারি সারি সাজিয়ে রেখেছে।

ঘুমন্ত যাত্রীদের দেখতে দেখতে হঠাৎ অমলের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল প্রীতি। অমল তাকিয়ে আছে। কি আশ্চর্য, এখনও সে ঘুমোয় নি!

চোখাচোখি হতে অমল হাসল, 'ঘুমোন নি?'

আড়ষ্ট গলায় প্রীতি বলল, 'না।'

'আমারও ঘুম আসছে না।' বলতে বলতে সোজা হয়ে বসল অমল।

অমল আবার বলল, 'এভাবে থার্ড ক্লাসে যাবার অভ্যাস আমার কোনকালেই নেই। এবার একটা এক্সপিরিয়েন্স হল।' যে হোল্ড-অলটার ওপর সে বসে আছে সেটা দেখিয়ে বলল, 'এটায় চড়ে কী মনে হচ্ছে জানেন?'

জগতের কোন ব্যাপারেই কৌতূহল নেই প্রীতির। তবু নিজের অজান্তেই যেন সে বলল, 'কী?'

'অশ্বারোহণের আনন্দ পাচ্ছি।'

চমৎকার কথা বলতে পারে অমল। প্রীতির ঠোঁটের প্রান্ত দুটো খানিক বিস্তৃত হয়ে হাসির আভা একটুক্ষণের জন্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

অমল এবার বলল, 'দিদি জামাইবাবু কি ঘুমিয়েছে?'

ললিতাকাকিমা মোহিতকাকাকে একবার দ্রুত দেখে নিল প্রীতি, কিছু বলল না।

অমল বলল, 'দিদির ঘুম সমন্ধে অবশ্য সন্দেহ নেই। কানের কাছে ঢাক পেটালেও জাগবে না। তবে জামাইবাবুর—' হাত বাড়িয়ে মোহিতকাকার কানের কাছে জোরে জোরে তুড়ি দিল অমল। নাকের কাছটায় সুড়সুড়ি এবং দু-চারটে খোঁচা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'না, জামাইবাবুর ঘুমটাও জেনুইন। এবার তাহলে একটা সিগারেট ধরানো যেতে পারে।'

ফস্ করে দেশলাই জ্বাললো অমল। সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ টান দিয়ে একটি একটি করে অনেকগুলো ধোঁয়ার বৃত্ত হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল। তারপর বলল, 'এ কামরায় আপনি আর আমি ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু আপনি আর আমি জেগে আছি।'

খুব সহজ সুরে কথাগুলো বলেছে অমল। নিশ্চয়ই কিছু না ভেবে বলেছে। এর ভেতর কিছু থাকা উচিতও নয়, এর সঙ্গে কোন ইঙ্গিত জুড়ে অর্থময় করে তোলাও অন্যায়। তবু প্রীতির বুকের ভেতরকার চির তুষারের দেশে কিসের যেন ছায়া পড়ল।

অমল বলল, 'জামাইবাবু তখন আপনার দুঃখের কথা কি যেন বলছিলেন। আপনার কথা জানতে ইচ্ছে করছে। ঘুম তো আসছে না। বলুন না।'

প্রায় ফিসফিস গলায় প্রীতি বলল, 'সে সব আপনার ভাল লাগবে না।'

'না লাগুক, আপনি বলুন।'

একটু চুপ করে থেকে প্রীতি বলল, 'মোহিতকাকু তো তখনই বললেন, পরে আপনাকে বলবেন। ওঁর কাছেই শুনবেন।'

অমল আর পীড়াপীড়ি করল না। কিছুক্ষণ দূরমনস্কের মতন সিগারেট খেয়ে গেল। তারপর বলল, 'আপনি খুব শাই—লাজুক—'

প্রীতি চুপ!

অমল আবার বলল, 'লাজুক না গম্ভীর, কোনটা বলুন তো?'

প্রীতি উত্তর দিল না।

অমল বলতে লাগল, 'আপনি বোধহয় লোকের সঙ্গে মেলামেশা তেমন পছন্দ করেন না।'

চমকে অমলের দিকে তাকাল প্রীতি। ভুসাওয়ালে এ কামরায় ডেকে তোলার পর অনেকবার অমলকে দেখেছে সে। মোহিতকাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অমল যখন হাসির ফোয়ারা ছোটাচ্ছিল নিজের অজান্তে প্রীতির চোখ দুটো ঘুরে ঘুরে তার মুখের ওপর গিয়ে পড়ছিল। কিন্তু সে দেখায় বিশ্লেষণ ছিল না। যেমন করে মানুষ অন্যমনস্কের মতন আকাশ ছাখে, পাখি ছাখে, অথবা আর কোন দৃশ্য, সেইভাবে অমলকে দেখছিল প্রীতি। কিন্তু এবার এই ঘুমন্ত কামরায় তারা দুজন ছাড়া যখন আর কেউ জেগে নেই তখন সমস্ত মনোযোগ চোখের মণিতে এনে অমলকে দেখতে লাগল সে।

দুবছর হল মোহিতকাকা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই দুবছরে ললিতাকাকিমার মুখে অন্তত হাজার বারও তাঁর ভাইয়ের কথা শুনতে হয়েছে। ললিতাকাকিমার বর্ণনায় একবিন্দু বাড়াবাড়ি ছিল না। অমল সুপুরুষ। নাক-চিবুক-কপাল, ব্যকব্রাশ করা কুচকুচে কালো চুল, ধারাল মুখ—কোথাও একটুকু খুঁত বার করা যাবে না। চওড়া কব্জি, মুঠোয় ধরা যায় কোমরটি এমনই সরু, তার ওপর দিকে বিশাল বুক। সুষমা এবং বলশালিতা, লাবণ্য আর পৌরুষ নিক্তিতে নিক্তিতে সমান সমান মেপে তার সর্বাঙ্গে এমন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে

অমলের দিকে তাকালে দৃষ্টি আরাম পায়। অমলের নিছক উপস্থিতিই খুব সুখদায়ক।

ললিতাকাকিমার এই ভাইটির সমস্ত আকর্ষণ তার চোখে। এমন প্রাণবন্ত উজ্জ্বল চোখ কদাচিৎ দেখা যায়। শুধু কি উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত, বিচিত্র রকমের দূরগামীও। যার দিকে অমল তাকায় সে দৃষ্টি বুকের গভীর পর্যন্ত চিকণ তীরের মতন বুঝিবা বিঁধে যায়। নইলে কেমন করে এই সামান্য সময়টুকুর ভেতর অমল বুঝতে পারল বেশী কথা বলতে ভালবাসে না প্রীতি, লোকের সঙ্গে মিশতে পারে না।

প্রীতি যে মিশতে পারে না, তার পেছনে দম্ভ নেই, অহঙ্কার নেই। অহঙ্কার করতে হলে কিছু মূলধন দরকার—হয় রূপ, না হয় গুণ। প্রীতির তেমন কিছুই নেই। তাকে ঘিরে যা রয়েছে তা হল সীমাহীন গ্লানি ; দুর্বহ অনিঃশেষ যন্ত্রণা। প্রীতির বুকের ভেতর সবগুলো দুয়ারই বন্ধ। সেগুলো খুলে যে বেরিয়ে আসবে তেমন ইচ্ছেটুকু আর অবশিষ্ট নেই। চার পাশে পৃথিবী রসে-রঙে-উচ্ছ্বাসে আবেগে টলোমলো হয়ে আছে, পা বাড়ালেই হাসি-গান-আনন্দের অফুরন্ত স্রোত। কিন্তু ঝাঁপ দিতে পারে না প্রীতি। পেছন থেকে অদৃশ্য কেউ শক্ত মুঠোয় তাকে যেন ধরে রাখে। হৃৎপিণ্ডের অতল থেকে ফিসফিসিয়ে কে যেন নিয়ত শাসায়, তোর জন্যে আনন্দ নয়। ওদিকে তুই পিঠ ফিরিয়ে রাখ।

সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা ধূসর নিঃশব্দ জনহীন দ্বীপে চারদিকে দেওয়াল তুলে নির্বাসিত হয়ে আছে প্রীতি।

অমলের গলা শোনা গেল, 'কী ভাবছেন ?'

অস্পষ্ট স্বরে প্রীতি বলল, 'কিছু না।'

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে অমল বলল, 'ভাবছেন আর বলছেন, কিছু না।'

হাতের কাছে উত্তর খুঁজে না পেয়ে কোনরকমে তাড়াতাড়ি প্রীতি বলে উঠল, 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।'

অমলের সঙ্গে অতি সামান্য অতি সাধারণ দু চারটে কথা হয়েছে। তবু কেন যেন প্রীতির মনে হচ্ছে, কামরার সবাই যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন ললিতাকাকিমার এই প্রাণবন্ত সুপুরুষ ভাইটির সঙ্গে জেগে বসে থাকা অনুচিত, বিপজ্জনক।

ঠোঁট টিপে বিচিত্র হাসল অমল। কেমন করে যেন বলল, 'ঘুম পাচ্ছে!'

অমল কি ঘুমের কথা বিশ্বাস করল না? তার চোখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস কোনটাই যাচাই করে নিতে সাহস হল না প্রীতির। নীচের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে ঘুমোন।'

প্রীতি ঘাড় হেলিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করল। কিন্তু চোখের পাতা বন্ধ হলেই কি ঘুম আসে? সে জেগে রইল আর ট্রেনের চাকার একটানা শব্দের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন একাকার হয়ে একটি নাম অবিরাম বেজে চলল—অমল, অমল, অমল—

দু হাত দিয়ে সবলে অমলের চিন্তা দূরে সরিয়ে দিতে চাইল প্রীতি, কিন্তু অবাধ্য ভাবনাটা নিতান্ত অকারণেই ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে হানা দিতে লাগল।

দুই

পরের দিন দুপুরে সুরাট।

স্টেশনে নেমে অমল বলল, 'ইণ্ডিয়ার এ প্রান্তে পা দিয়ে লোকে প্রথমে যায় সৌরাষ্ট্রে, দ্বারকা ছাখে, প্রভাস ছাখে কিংবা গির ফরেস্ট। কেউ কেউ পোরবন্দর, বরোদা, ভুরুকচ্ছেও যায়। আর আপনি কিনা পয়লাই সুরাট আক্রমণ করলেন জামাইবাবু? ফেরার পথে সুরাট দেখে গেলেই তো হত।'

মোহিতকাকা বললেন, 'সুরাট সম্পর্কে আমার নিদারুণ মোহ আছে ভাই।'

'কি রকম?'

'ছেলেবেলায় হিস্ট্রিতে এই জায়গার কথা পড়েছি। এখানে কে না হানা দিয়েছে? পর্তুগীজ এসেছে, মোগলরা এসেছে, ডাচরা এসেছে, ফরাসীরা এসেছে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা দিল্লীর নবাবের কাছ থেকে

সুরাটে কুঠি তৈরির অধিকার পায় ; সেটা খুব সম্ভব নাইনটিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরির মাঝামাঝি সময়। নানা জাতি যুগে যুগে হানা দিয়েছে, এমন জায়গা সারা ভারতবর্ষে বোধ হয় খুব বেশী নেই।' মোহিতকাকা বলতে লাগলেন, 'ছেলেবেলা থেকেই আমার ইচ্ছে সুরাট দেখব ; ইচ্ছে না বলে স্বপ্নও বলতে পার। তাই এবার যখন বেরিয়ে পড়া গেল তখন ভাবলাম এদিকে এসে প্রথমেই সুরাট যাব।'

অমল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ললিতাকাকিমা বললেন, 'খুব তো হিস্ট্রি আওড়ানো হচ্ছে, এদিকে হুঁশ আছে ?'

স্ত্রীর দিকে ফিরে দু হাত জোড় করে মোহিতকাকা বললেন, 'হার ম্যাজেস্টি আজ্ঞা করুন—'

'ইয়ার্কি দিতে হবে না। কাল সারারাত একটুও ঘুমোতে পারিনি ; এখন যদি চান করতে না পারি নির্ঘাৎ মরে যাব।'

'ঘুমোতে পারনি, বল কি ?'

'থার্ড ক্লাসের ঐ ভিড়ে-গরমে-নোংরায় কখনো ঘুমনো যায় ! তার ওপর বিচ্ছিরি রকমের ঝাঁকুনি।'

'সত্যি বলছ, ঘুমোওনি !' মোহিতকাকার চোখ গোলাকার হয়ে গেল।

'নিশ্চয়ই ঘুমোইনি !'

'আমরা যে কামরায় ছিলাম তার যাত্রীদের জিজ্ঞেস করলে অন্যরকম সাক্ষ্য দেবে কিন্তু।'

চোখ কুঁচকে ললিতাকাকিমা বললেন, 'কী সাক্ষ্য দেবে শুনি ?'

'কাল সারারাত ঘুমের ঘোরে তোমার নাকে পুঁই পুঁই করে সারেঙ্গি বেজেছে।'

'আহা-হা—' গলায় কাঁপন তুলে কেমন করে যেন শব্দটা উচ্চারণ করলেন ললিতাকাকিমা।

মোহিতকাকা কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই অমল বলে উঠল, 'তারা কিন্তু আরো একটা কথা বলবে জামাইবাবু।'

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে মোহিতকাকা বললেন, 'কী ?'

'সেজদির সারেঙ্গির সঙ্গে আপনার নাকও সারারাত বিগ ড্রাম বাজিয়েছে। সঙ্গত ভালই হয়েছিল।'

সবাই হেসে উঠল। এর ভেতর যূথিকার মাতামাতিই সব চাইতে বেশী। শরীরে ঢেউ তুলে তীক্ষ্ণ খিল খিল শব্দে সে হাসতে লাগল। একবার হাসতে শুরু করলে সহজে থামতে চায় না মেয়েটা।

যূথিকার দিকে ফিরে অমল এবার বলল, 'তোমার কিন্তু ঐরকম হাসা উচিত নয় যূথি।'

যূথিকার হাসি থমকে গেল, 'কেন?'

'তোমার নাকও কমতি যায়নি ; সমানে এস্রাজে ছড় টেনে গেছে। তিনজনে মিলে তোমরা একেবারে জলসার আসর বসিয়ে দিয়েছিলে।'

নাকের ভেতর থেকে সরু আওয়াজ বার করে যূথিকা বলল, 'উঁ হু-হু-হু, আমার নাকে এস্রাজ বাজছিল—আপনাকে বলেছে!'

এদিকে মোহিতকাকা চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'ইম্‌পসিবল, আমার নাক কখনও ডাকে না।'

অমল বলল, 'হাজার বার ডাকে ; প্রচণ্ডভাবে ডাকে।'

'সাক্ষী আছে?'

'নিশ্চয়ই'। নিজের কান দুটো দেখিয়ে অমল বলল, 'এরা সাক্ষী।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে মোহিতকাকা বললেন, 'উইটনেস হিসেবে তুমি অচল।'

'কারণ?'

'কারণ তোমার সিস্টারের সারেঙ্গি বাজাবার কথা যেই বলেছি অমনি তুমি আমার নাক ডাকার কথা তুললে। এর ভেতর মোটিভ আছে। মোটিভ নিয়ে সত্যভাষণ সম্ভব না ব্রাদার।'

'আমার কী মোটিভ থাকতে পারে?'

'সেটা হল আমাকে একই দোষে দোষী করে বোনের সম্মান রক্ষা।'

অমল বলল, 'ট্রেন থেকে নেমে পড়েছি, এখন সাক্ষী কোথায় পাই।' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'সাক্ষী সাক্ষী করছি, অথচ সাক্ষী তো হাতের কাছেই রয়েছে।'

মোহিতকাকা শুধোলেন, 'কে?'

'উনি—' প্রীতির দিকে আঙুল দেখিয়ে অমল বলল, 'প্রীতিদেবী

তো আপনার নিজের লোক, আমার সঙ্গে এখন পর্যন্ত ভাল করে আলাপই হয়নি। উনি নিশ্চয়ই আমার হয়ে মিথ্যে বলবেন না।'

মোহিতকাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রীতি কি জেগে ছিলি ?'

প্রীতি উত্তর দেবার আগেই অমল বলল, 'উনি আর আমি এই দুজনে শুধু জেগে ছিলাম। আপনারা ঘুমোচ্ছিলেন।'

থেমে থেমে কেমন করে যেন মোহিতকাকা বললেন, 'তোমরা দুজনে শুধু জেগে ছিলে ?'

মোহিতকাকার স্বরে এমন কিছু আছে কি, অস্ফুট সংশয় সন্দেহ অথবা অন্য কিছু—প্রীতি ঠিক বুঝতে পারল না। নিজের অজান্তে তার চোখ ললিতাকাকিমার দিকে ফিরল, সেখান থেকে যূথিকার মুখ ঘুরে মোহিতকাকার চোখে এসে স্থির হল।

ললিতাকাকিমার কপাল কেমন যেন কুঁচকে গেছে। যূথিকার চোখের তারা দুটো নিশ্চল। মোহিতকাকার চোখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কোনদিনই যায় না। দু বছর ওঁকে দেখছে প্রীতি। ভেতর দিকের কোন দুরন্ত আবেগ অথবা ফেনায়িত তরঙ্গকে মোহিতকাকা কখনও বাইরে আসতে দ্যান না, সব সময় গুহাগোপন করে রাখেন।

এক রকমের নদী আছে যা আপাত স্থির কিন্তু তলায় তলায় তার গহনসঞ্চারী চোরা ঘূর্ণি। মোহিতকাকাকে কি তেমন দেখাচ্ছে ? প্রীতি বুঝতে পারল না। তবে এটুকু বোঝা গেল খানিক আগে উচ্ছ্বসিত হাসিতে আর ঠাট্টায় ঠাট্টায় লঘুস্বরের যে রিমঝিম অর্কেস্ট্রা বেজে যাচ্ছিল তার সুর কেটে গেছে। কোথায় যেন একটা ছায়া পড়তে শুরু করেছে।

হঠাৎ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন ললিতাকাকিমা, 'সংয়ের মত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলে যে। চান না হয় পরে হবে। এখন কোথাও একটু বসবার ব্যবস্থা করবে তো।'

ঝঙ্কারটা কার উদ্দেশ্যে বুঝতে অসুবিধে হল না। মোহিতকাকা আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা পেলেন না। অমলকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটলেন।

* * *

একটু পর সবাইকে নিয়ে থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে ঢুকলেন মোহিত-

কাকা। খুব একটা ভিড় নেই; আয়েস করে হাত পা ছড়িয়ে বসা যায়। তা ছাড়া জল এবং স্নানের ব্যবস্থাও আছে; রান্না-বান্না করার জায়গাও।

ললিতাকাকিমা বললেন, 'এ কি, এখানে কেন?'

মোহিতকাকা অবাক। বললেন, 'তবে কোথায় যাব?'

'ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে চল। কাল ট্রেনে ওঠবার পর থেকে ঢের কষ্ট করেছি, আর পারব না। কিছুতেই না।'

যূথিকাও নাকিসুরে বলে চলল, 'চল না দাদা, ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে।'

'নো।' জোরে জোরে মাথা নাড়লেন মোহিতকাকা।

'না কেন?' ললিতাকাকিমা প্রায় রুখে উঠলেন।

'থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার হয়ে কিছুতেই আমি আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমের আরাম পেতে পারি না। তা রীতিমত অন্যায়।'

ললিতাকাকিমা 'যুধিষ্ঠির' বলে বিদ্রূপ করলেন, যূথিকার নাকের ভেতর থেকে একটানা ঘ্যানঘ্যানানি চলল কিন্তু মোহিতকাকাকে কিছুতেই টলানো গেল না।

সবার বসবার ব্যবস্থা করে মোহিতকাকা বললেন, 'গোবিন্দ তো অসুখ বাধিয়ে বসেছে। যাই একটা লোক-টোক যোগাড় করে আনি; যতক্ষণ থাকি ফুট-ফরমাস খাটবে; এটা ওটা এনে দেবে—' বলে বেরিয়ে গেলেন। অমলও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

গোবিন্দ মোহিতকাকাদের ছোকরা চাকর। আজ সুরাট স্টেশনে নামার পর দেখা গেছে তার খুব জ্বর; গা একেবারে পুরে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর একটা লোক ধরে নিয়ে এলেন মোহিতকাকা; হুকুম মত সে টুকিটাকি কাজ করতে লাগল।

এদিকে জিরিয়ে নিয়ে একে একে সবাই স্নানের পালা চুকিয়ে ফেলল। তারপর অমল বলল, 'খাওয়া-দাওয়ার কী হবে জামাইবাবু?'

মোহিতকাকা বললেন, 'তাই তো ভাবছি।'

'স্টেশনে ভাল রেস্তোরাঁ আছে; শহরে গেলে ভাল হোটেল মিলবে।'

'ওরে সর্বনাশ—' দুহাত প্রবলবেগে নাড়তে লাগলেন মোহিত-

খাকা, 'হোটেল-রেস্তোরাঁ আমার পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা ব্রাদার। পেটটাকে গ্যাসট্রিক আলসারের কাছে প্রায় দানপত্র করে দিয়েছিলাম। কত কষ্টে যে ওটার স্বত্ব ফিরে পেয়েছি, আমিই জানি। ঝাল-মশলাহীন রান্না ছাড়া আমার চলে না।'

'কিন্তু—' অমলকে চিন্তিত দেখাল।

'কী?'

'আপনার ফরমাস মতন রান্না এখানে কোথায় পাবেন?'

'ব্রাদার, তৈরী না হয়েই কি বেরিয়েছি মনে করেছ?' মোহিতকাকা হাসলেন, 'স্টোভ-হাতা-খুন্তি-বেড়ি, গন্ধমাদন মাথায় করে এনেছি। চলো, বাজারের খোঁজে বেড়িয়ে পড়া যাক।'

'কিন্তু এখানে রাঁধবেন কোথায়?'

'ওয়েটিং রুমেরই এককোণে; চাদর-টাদর টাঙিয়ে আড়াল করে দেবখ'ন। কেউ টের পাবে না।'

'আপনি একটা কেলেঙ্কারি করে বসবেন দেখছি।'

উত্তর না দিয়ে মোহিতকাকা হাসলেন শুধু।

খুঁজে বার করতে হল না। স্টেশনের প্রায় গা ঘেঁষেই প্রকাণ্ড বাজার; অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

সরু চাল, কিছু সবজি, কলা, দই, রুটি, মাখন ইত্যাদি কিনতে কিনতে নজরে পড়ল একধারে কয়েকটা লোক মাছ নিয়ে বসেছে। রুপোর পাতের মত চকচকে লোভনীয় পাবদা আর ট্যাংরা মাছ। বাংলাদেশ থেকে এতদূরে খাঁটি বঙ্গীয় মীনকুলকে দেখে লোভ আর জয় করা গেল না। অতএব সের দুয়েকের মত ট্যাংরা পাবদা থলিতে এসে উঠল।

বাজার থেকে ফিরে থলির মুখ মেলে ধরে মোহিতকাকা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'দ্যাখো দ্যাখো কাদের এনেছি।'

ললিতাকাকিমা আর যূথিকা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

মোহিতকাকা বলতে লাগলেন, 'এতদূরে এসে দেশোয়ালীদের দেখে লোভ আর সামলাতে পারিনি। কলকাতায় বিশ টাকা দিলেও এমন ফ্রেশ আর এত বড় সাইজের মাছ পাবে না। ভাবছি আজ অনিয়ম করব।'

সবাই খুশি, কলকাতায় এমন মাছ ইদানীং দুর্লভ। আনন্দে সবার চোখ চকচক করছে। মাছের দিকে চোখ রেখে ললিতাকাকিমা বললেন, 'অনিয়ম বলতে?'

'আজ একটু ঝাল খাব। বেশ যত্ন করে আদা-টাদা দিয়ে ট্যাংরার দো-পেঁয়াজি বানাও আর পাবদাটা দিয়ে ঝোল। হিংয়ের বড়ি আর ধনেপাতা হলে পাবদা জমত ভাল, না কি বল?'

'খাওয়ার তো খুব চোট দেখছি। পেটটা সেরে এসেছে কিনা, ঝাল-টাল খেয়ে শেষে এক কাণ্ড বাধাও।' ললিতকাকিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। কিন্তু সেটা যে প্রশ্রয়ের আরেক নাম, বুঝতে অসুবিধে হল না।

মোহিতকাকা তবু বললেন, 'কিচ্ছু হবে না গিন্নী, তুমি দেখে নিও। আর যদি একটু হয়তো হবে।' অর্থাৎ এমন মাছ মুঠোয় পেয়ে তরিবত করে খাবেন না, তা হতে পারে না।

ললিতাকাকিমা বর দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'তথাস্তু! কিন্তু আজই শুধু; এরপর ঝাল খেতে চাইলে জিভখানা কেটে নেওয়া হবে।'

মোহিতকাকা তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করলেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, সে কথা আর বলতে।'

একটু আগে রাতজাগার ব্যাপার নিয়ে কেমন একটা মেঘলা ভাব ঘনিয়ে এসেছিল; হাল্কা সুরের কথাবার্তায় মেঘ উড়ে যেতে লাগল। প্রীতির মনে হল আবহাওয়াটা আবার নির্মল ঝলমলে প্রসন্ন হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

অমল বলল, 'রান্নাবান্নার তো দেরী আছে। নাড়ি-টাড়ি একেবারে জ্বলে যাচ্ছে। কিছু খাদ্য জমা না দিলে পাকস্থলী কিন্তু বিদ্রোহ করে বসবে। অন্তত এক কাপ চা না হলে আর চলছে না।'

সবাই এলোমেলোভাবে বসে ছিল। ললিতাকাকিমা কুলিটাকে দিয়ে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়ে শতরঞ্চি এবং তার ওপর সুদৃশ্য চাদর পাতলেন।

কুলিটা এ অঞ্চলের লোক; তবে হিন্দী কিছু কিছু বোঝে। চাদর শতরঞ্চির ফরাস পাতা হলে ললিতাকাকিমা বললেন, 'তুই ওখানে গিয়ে বোস্।' অমলদের বললেন, 'তোরা এখানে আয়।'

নির্দেশমত কুলিটা খানিক দূরে গিয়ে বসল। যূথিকা অমল ললিতাকাকিমা আর মোহিতকাকা—চারজনে ফরাসে বসলেন। ছোকরা চাকরটা জ্বর গায়ে ওয়েটিং রুমের সম্পত্তি একটা বেঞ্চিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। প্রীতি একপাশে দাঁড়িয়ে।

এবার ললিতাকাকিমা প্রীতির দিকে তাকালেন। বললেন, 'স্টোভ বার করে চায়ের জলটা চড়িয়ে দাও—'

প্রীতি এই নির্দেশটুকুর জন্যই বোধহয় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। বলামাত্র লোহার ট্রাঙ্ক খুলে স্টোভ-প্লেট-কাপ-ডিশ-খুন্তি যাবতীয় সরঞ্জাম বার করে ফেলল। তারপর স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে ক্ষিপ্র হাতে বম্বে থেকে আনা কেক সাজিয়ে প্রত্যেকের সমান রেখে গেল।

ললিতাকাকিমা শুধু চায়ের জল চড়াতেই বলেছিলেন। কিন্তু কেক সাজানো, সবার সামনে প্লেট রেখে রেখে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি যেন অলিখিত চুক্তির মতন। চায়ের জল চড়াতে বললেই এগুলো করতে হবে এবং প্রীতিকেই করতে হবে।

স্টোভটা একটানা গর্জন করে চলেছে। তার উর্ধ্বমুখ নীলাভ শিখায় দেখতে দেখতে চায়ের জল টগবগ করে উঠল। চা ছেঁকে সবাইকে দিয়ে অস্ফুটে প্রীতি বলল, 'এবার কী করব?'

ললিতাকাকিমা বললেন, 'মাছগুলো কুটে ফেল; তারপর রান্নার যোগাড়যন্ত্র কর।'

অমল বোধহয় লক্ষ্য করেছিল। ব্যস্তভাবে বলল, 'সে কি, উনি যে চা-টা কিছুই খেলেন না।'

মোহিতকাকা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই তো। তোর খাবার-টাবার এখানে নিয়ে আয় প্রীতি। আগে খাওয়া, তারপর তো কাজ।'

প্রীতির খাওয়ার ব্যাপারে অমলের মনোযোগ ললিতাকাকিমাকে খুশি করেনি। অত্যন্ত বিরস আর রুক্ষ স্বরে তিনি বললেন, 'না খেয়ে আমি ওকে কাজ করতে বলিনি। আমাকে তোমরা নিষ্ঠুর পশু-টশু ভাবো নাকি?

প্রীতি বিব্রত, কুণ্ঠিত। এমনিতেই তার স্বভাব শামুকের মত; আরো খানিক নিজেকে গুটিয়ে নিল সে।

ব্যাপারটা অতি সামান্য, তুচ্ছই বলা যায়। ললিতাকাকিমার এতখানি অসন্তুষ্ট হবার কারণ ছিল না। হঠাৎ অমলের ওপর মনে মনে খুব বিরক্ত হল প্রীতি। সে খাক বা না খাক, তা লক্ষ্য করার কী প্রয়োজন অমলের ?

মোহিতকাকা ডাকা সত্ত্বেও খাবার-টাবার নিয়ে সবার কাছে এসে বসল না প্রীতি। দূরে, নিজেকে খানিক আড়াল করে রেখে দ্রুত খাওয়ার পালা চুকিয়ে ফেলল। তারপর মাছ-টাছ কুটে রান্না-বান্নার আয়োজন করতে লাগল।

মোহিতকাকাদের চা টা খাওয়া এখনও শেষ হয়নি। খাওয়ার চাইতে গল্পই হচ্ছে বেশি। তাঁদের টুকরো টুকরো কথা কানে আসতে লাগল।

মোহিতকাকা বললেন, 'এই তুপুরবেলা চা-কেক-টেক খাওয়া হচ্ছে। ভাতের খিদে থাকলে হয়।'

অমল বলল, 'নিশ্চয়ই থাকবে। এখন সাড়ে বারোটা। রান্না শেষ হতে অন্তত তুটো। দেখবেন তখন পেটের ভেতর আগুন জ্বলে উঠেছে। এদিককার জল-হাওয়া খুব ভাল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়।'

'দেখা যাক।'

একটু নীরবতা। তারপর মোহিতকাকা বললেন, 'একটা গাইড নিলে ভাল হয়, না কি বল ?'

'গাইড! গাইড দিয়ে কী হবে ?' অমল শুধলো।

'সুরাট শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যে।'

'তার দরকার নেই।'

কিন্তু এ জায়গার কোথায় কী আছে আমরা তো জানি না।'

'আমি জানি, আপনাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব'খন।'

যূথিকার গলা এবার শোনা গেল, 'আপনি কেমন করে দেখাবেন। কখনও কি এখানে এসেছেন ?'

অমল বলল, 'ভুসাওয়াল থেকে এই জায়গাটা আর কত দূর। অফিসের বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে একবার এসেছিলাম।'

মোহিতকাকা বললেন, 'তবে তো ভালই হল। আচ্ছা এখানে দেখবার কী কী আছে ?'

'আছে কিছু কিছু।'

'কতক্ষণ লাগবে সব দেখতে?'

'ম্যাক্সিমাম ঘণ্টা পাঁচেক।'

'ভেরি গুড, আজকেই তা হলে বখেড়া মিটিয়ে ফেলা যাবে।'

অমল বলল, 'শহর দেখে ফিরে এসে আজ রাতেই আমরা সৌরাষ্ট্রের ট্রেন ধরতে পারব।'

যূথিকা বলল, 'আপনি এদিককার সব দেখেছেন?'

অমল বলল, 'এদিকটা তো একটুখানি জায়গা নয়। গুজরাত প্রভিন্সের তিনটে ভাগ—গুজরাত, সৌরাষ্ট্র আর কচ্ছভুজ। তিনে মিলে বিরাট এরিয়া। ঘোরাঘুরি আমার তেমন ভাল লাগে না, তবে সেবার আফিসের বন্ধুরা জোর করে ধরে এনেছিল। দু-দশ দিনে যেটুকু দেখা যায় ততটুকুই দেখেছি।'

ইতিমধ্যে কড়াইয়ে তেল দিয়ে মাছ ভাজতে শুরু করেছে প্রীতি। ভাজা মাছের মিষ্টি গন্ধে চারিদিক ভরে গেছে।

ষষ্ঠ ঋতুর বাতাসে সর্বক্ষণ মত্ততা ভর করে থাকে। নেশায় বেহুঁশ হয়ে দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়ানোতেই তার যত আনন্দ। ফলে ওয়েটিং রুমের খবর আর তার ভেতরেই আবদ্ধ নেই, ভাজা মাছের খবর চারিদিকে রাষ্ট্র করে দেবার জন্য সে শুধু বার বার বাইরে ছুটছে। এর ফলে দু'টো মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল।

প্রথমত, মোহিতকাকাদের আসর যখন মোটামুটি জমে ওঠার মুখে ঠিক সেই সময় মাছভাজার গন্ধটা নাকে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে এক কাণ্ড করে বসল অমল। হঠাৎ প্রীতির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'উঁহু-উঁহু, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।'

মোহিতকাকারা উন্মুখ হলেন, 'কী?'

'আমরা আরাম করে আড্ডা মারব। আর প্রীতি দেবী একা একা খেটে যাবেন, তা হতে পারে না। সেজদি, যূথিকা—তোমরা ওঁকে হেল্প কর। যদি দরকার হয় আমিও হাত লাগাতে পারি।'

হৃদ্‌পিণ্ডের উত্থান-পতন দ্রুততর হল প্রীতির। পৃথিবীর সবটুকু সঙ্কোচ চারিদিক থেকে তাকে যেন ঘিরে ধরতে লাগল। অমল জানে

না, অকারণ সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে প্রীতির কতখানি ক্ষতি করে যাচ্ছে।

মোহিতকাকারা তার আশ্রয়দাতা। জগতের সব দুয়ার যখন বন্ধ তখন ওঁরাই কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের সুখের জন্য আরামের জন্য মনোরঞ্জনের জন্য সব কিছু করতে হবে প্রীতিকে। এই হচ্ছে নিয়ম। লেখাপড়া করে এই শর্তে তাকে অবশ্যই আশ্রয় দন নি মোহিতকাকারা। নিজে নিজেই এই শর্ত ঠিক করে অলিখিত ;ক্তিপত্রে সই করে দিয়েছে প্রীতি।

এদিকে যূথিকা চমকে উঠেছে। ললিতাকাকিমার চোখে মুখে কঠোর রেখায় বিরক্তি ফুটেছে। বিনা-কাজের দিনযাপনে যাঁরা অভ্যস্ত, কাজের কথায় তাঁদের রাগ হবার কথাই। ললিতাকাকিমা কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মোহিতকাকা বলে উঠলেন, প্রীতির রান্নার হাত এক্সেলেণ্ট, সেইজন্যেই ওকে রাঁধতে বলেছে তোমার দিদি। নইলে কলকাতায় ওকে কি রাঁধতে হয়? প্রীতিকেই জিজ্ঞেস করে দেখ।'

হঠাৎ কি হল ললিতাকাকিমার, বললেন, 'যূথিকার রান্নার হাতও চমৎকার, ট্যাংরা মাছের দো-পেঁয়াজিটা যূথি রাঁধবে।'

প্রীতি অবাক। যে মেয়ে কলকাতায় টু-সীটারের চাকায় ঝড় তুলে বেড়ায় তার হাতে হাতা-খুন্তি তুলে দেবার পেছনে ললিতা-কাকিমার কী পরিকল্পনা আছে, বুঝতে পারা গেল না।

দু নম্বর প্রতিক্রিয়াটা এইরকম। ওয়েটিং রুমে যে সব যাত্রী হাত-পা ছড়িয়ে জিরিয়ে নিচ্ছিল, মাছের গন্ধে তারা চকিত হয়ে উঠেছে। বাতাসে বারকয়েক কি যেন শুঁকে মালপত্র নিয়ে নিমেষে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। ডি-ডি-টি ছড়ালে পোকামাকড়ের যে রকম অবস্থা হয় অনেকটা সেই রকম।

সেই কুলিটা দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে ঢুলছিল, চমকে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। বলল, 'এ জী—'

মোহিতকাকা বললেন, 'কী বলছিস?'

ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কুলিটা বলল, 'তোমরা মাছ রাঁধছ?'

'হ্যাঁ। কেন রে?'

উত্তর না দিয়ে কুলিটা উধাও হল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেলের স্টাফেরা বর্গীর মত রে-রে করে ছুটে এল। সবার নাকেই চার ভাঁজ আট ভাঁজ করে রুমাল চাপা। উত্তেজিত গলায় তারা বলল, 'এ আপনারা কী করেছেন?'

মোহিতকাকা বললেন, 'কী করেছি?'

'দিস ইজ ওয়েটিং রুম, আপনারা এটাকে রসুইখানা বানিয়ে ছাড়লেন!'

মোহিতকাকা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তাঁর পাকস্থলীতে হোটেল রেস্তোরাঁর খাবার সহ্য হয় না, তাই স্টোভ ধরিয়ে চাট্টি ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিয়েছেন।

'উঁহু ভাতে-ভাত নয়, আপনারা মাছ রাঁধছেন।'

মোহিতকাকাকে স্বীকার করতেই হল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, মাছ।'

'নিশ্চয়ই বাঙালী।'

'তাতে আর সন্দেহ কি।' মোহিতকাকা বললেন, 'পাবদা আর ট্যাংরা মাছ রান্না হচ্ছে। অতি উপাদেয় আর টেস্টফুল। যদি বলেন, একবাটি করে আপনাদের—'

আর্তনাদ করে রেলের স্টাফরা তিন পা পিছিয়ে গেল। জিভ কেটে জানাল, তাদের কেউ কাথিয়াবাড়ী ব্রাহ্মণ, কেউ গুজরাতের উচ্চবর্ণ হিন্দু, মাছ স্পর্শ করা দূরে থাক, মাছের নাম শোনা পর্যন্ত তাদের বারণ। এও জানাল বাঙালী জাতটাকে তারা মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করে কিন্তু এই মাছ খাওয়াটা বরদাস্ত করা অসম্ভব।

অমল এই সময় বলে উঠল, 'মাছ বাদ দিয়ে বাঙালীর আর রইল কী?'

রেলের স্টাফেরা বলল, 'সে যাই হোক, এখানে রান্না করে আপনারা খুব অন্যায় করেছেন। ওয়েটিং রুম কারো একার সম্পত্তি নয়। অন্য প্যাসেঞ্জাররা অভিযোগ করছে।'

'এদিকে কেউ কি মাছ খায় না?'

'খায় আদিবাসীরা আর শবর শ্রেণীর লোকেরা। ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা খায় না। সে যাক গে, ফিনাইল দেওয়া হচ্ছে। ইমিডিয়েটলি ঘরটা ধুয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। মাছের গন্ধ থাকলে প্যাসেঞ্জাররা আমাদের নামে রিপোর্ট করে দেবে।'

করুণ অনুনয়ের সুরে মোহিতকাকা বললেন, 'দেখুন অন্যায় যা হবার তা তো হয়েই গেছে। অনুগ্রহ করে আর মিনিট কুড়ি সময় দিন, খাওয়া হলেই ঘর ধুয়ে দেব।'

নিজেদের ভেতর কি পরামর্শ করে রেলের স্টাফেরা বলল, 'কুড়ি মিনিটই, তার বেশি এক সেকেণ্ড সময় দেওয়া হবে না।'

'সো কাইণ্ড অফ ইউ।' মোহিতকাকা হাতজোড় করে বললেন, 'এক সেকেণ্ড বেশি আমরা নেবও না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

রেলের লোকেরা চলে গেলে মোহিতকাকা বললেন, 'পাবদা-ট্যাংরা আলাদা রাঁধার দরকার নেই। সব একসঙ্গে করে ফেল। তরিবত করে একটু যে খাব, তা আর কপালে নেই। ভাগ্যে না থাকলে আমি আর কি করতে পারি।'

কুড়ি মিনিটের ভেতরেই খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে বাসন মেজে ফিনাইল দিয়ে ওয়েটিং রুম ধুয়ে দেওয়া হল। প্রীতিই প্রায় সব করল। অবশ্য ললিতাকাকিমা আর যূথিকা এ ব্যাপারে তাকে একটু একটু সাহায্য করেছে, খুব সম্ভব অমলের ভয়ে। অবুঝ সংসার-অনভিজ্ঞ এই মানুষটা আবার কী মন্তব্য করে বসবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

ফুট-ফরমাস খাটার জন্য একটা লোক রাখা হয়েছিল। কিন্তু মাছের গন্ধে নাকে ঢুকতে সেই যে সে উধাও হয়েছে আর তাকে দেখা গেল না। বুঝিবা সুরাটের সীমানা পার হয়ে গেছে। কুলিটা নিঃসন্দেহে মৎস্যবিদ্বেষীদের দলে।

সমস্ত হাঙ্গামা মিটিয়ে মালপত্র ঘন্টাকয়েকের জন্য স্টেশনের জিম্মায় রেখে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অমল। এখন থেকে গাইডের ভূমিকাটা তারই। ছোকরা চাকরটা সর্বাঙ্গে উত্তাপ নিয়ে ওয়েটিং রুমে থেকে গেল।

দুটো টাঙ্গা ডাকা হয়েছে।

ললিতাকাকিমা এখানে একটু চাতুরী খেললেন। তাড়াতাড়ি একটা টাঙ্গায় উঠে মোহিতকাকাকে ডেকে পাশে বসালেন। তারপর প্রীতিকে ডাকতে লাগলেন, 'এসো প্রীতি, এখানে এসো—'

অর্থাৎ তিনজনে একটা টাঙ্গায় যাবেন। বাকিটা অমল আর

যূথিকার জন্য। প্রীতির মনের ভেতর যে চির-তুষারের দেশ, সেখানে কৌতুকের অস্পষ্ট একটু ঝিলিমিলি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

মোহিতকাকা ব্যবসাদার মানুষ কিন্তু সবসময় সবরকম ঘোরপ্যাঁচ বোঝেন না। লজ্জিত মুখে বললেন, 'এর ভেতর ও কোথায় উঠবে?'

ললিতাকাকিমা বললেন, 'এর ভেতরেই উঠবে। একটু চেপে-চুপে বসলে ঠিক জায়গা হয়ে যাবে।'

মোহিতকাকা মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললেন, 'তুমি বোধহয় জানো না তোমার আমার আয়তন কতখানি। বিশেষ করে কোমরের তলার দিকের বেড়টা—'

মোহিতকাকার কথা শেষ হবার আগেই বারুদের স্তূপে আগুন ধরে গেল। ললিতাকাকিমা গর্জন করে উঠলেন, 'অসভ্য, ইতর। সবসময় তোমার ইতরামি—'

মোহিতকাকা কিন্তু দমলেন না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'টাঙ্গার থ্রী-ফোর্থস্ দখল করেছ। বাকি সিকিভাগে আমার অর্ধেকটা রয়েছে আর বাকি আধখানা তো টাঙ্গার বাইরে ঝুলছে। এর ভেতর প্রীতিকে তুললে—'

স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি করে যত আনন্দ মোহিতকাকার। এটা তাঁর খুবই প্রিয় খেলা। চোখাচোখি হলেই স্ত্রীর দেহের বিপুলতা নিয়ে তিনি রগড় করে থাকেন। মজা করা ছাড়া এর পেছনে আর কিছুই নেই। স্বামীর রসিকতা যে নির্মল এবং স্বচ্ছ তা বোঝেন ললিতা-কাকিমা। তাই মোহিতকাকার সব ঠাট্টাতেই তিনি তাল দিয়ে ওঠেন। আজ কিন্তু যা করলেন, একেবারে অভাবনীয়। আরক্ত চোখে স্বামীকে বিদ্ধ করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চুপ করো, চুপ করো। ছোটলোক কোথাকার—' বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

সবাই স্তম্ভিত। স্ত্রীর এতখানি রাগের নেপথ্যে কি এমন কারণ থাকতে পারে বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন মোহিতকাকা।

কারণটা খানিক অনুমান করতে পারছিল প্রীতি। পারছিল বলেই লজ্জায় ধিক্কারে গ্লানিতে তার হৃদ্‌পিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে আসছিল।